Downloaded from: justpaste.it/8096w

ধারাবাহিক উপন্যাস

জুলফিকার
ডঃ মিসকীন আলী হেজাজী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরিকল্পনার প্রথম অংশ মোতাবেক উখলগুর অবরোধ শক্ত করা হয়। তমিরখানশুরা ও তিবলিস থেকে আরো সেনা তলব করা হয়। তমিরখানশুরা থেকে দশ হাজার নতুন সৈন্য এসে পৌঁছলে উখলগুর অবরুদ্ধ মুসলিম সেনাদের উপর চাপ বৃদ্ধির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। বড় তোপগুলো উঁচু জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। ছোটগুলোকে আরো সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। উখলগুর চারদিকের প্রহরাও কঠোর করা হয়।

১৩ জুলাই ভোরে তোপগুলো আগুন আর লোহা নির্গত করতে শুরু করে। বিরামহীন তীব্র গোলাবর্ষণে অধীন রুশ অফিসাররা পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়ে। এক অফিসার সেনাপতি গ্রেব-এর কাছে সবিনয়ে জানতে চায় যে, জনাব! পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা নেই কি? সেনাপতি গ্রেব ধমকের সুরে জবাব দেয়, পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে বেশি অবগত। প্রতিটি অভিযানই আমাদের পরিকল্পনার একটি অংশ। তুমি তোমার নিজের কাজ কর গিয়ে।

২ আগস্ট ভোরে পদাতিক বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ পায়। রুশ পদাতিক বাহিনীর সেনারা মুজাহিদদের আক্রমণ এড়িয়ে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পদে পদে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রায় একশত মুজাহিদ গুলি বৃষ্টির মধ্য দিয়ে পদাতিক রুশ সেনাদের দিকে ধেয়ে আসে। নিকটে পৌঁছতে পৌঁছতে বাইশজন মুজাহিদ শহীদ কিংবা গুরুতর আহত হয়। অবশিষ্টরা রুশ সেনাদের ভিতরে ঢুকে রাইফেলের পরিবর্তে তাদের প্রিয় হাতিয়ার খঞ্জর চালাতে শুরু করে। মুজাহিদদের এই সীমাহীন দুঃসাহসিক অভিযান রুশ সেনাদের বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে তোলে। দিশেহারার মত তারা নিজেদের লোকদের উপর গুলি ছুড়তে শুরু করে। এক ঘণ্টা যাবত তীব্র লড়াই চলে। লড়াই করতে করতে সকল মুজাহিদ শহীদ হয়ে যায়। জীবন দিয়ে তারা রুশ সেনাদের মনে আরেকবারের মত আতংক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। আক্রমণকারী পদাতিক রুশ সেনাদের সংখ্যা ছিল আড়াই হাজার। তার সামান্য ক'জন-ই জীবন নিয়ে ফিরে যেতে সক্ষম হয়।

সেনাপতি গ্রেব দ্রুত দ্বিতীয় বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়। অতঃপর তৃতীয় বাহিনী- তারপর চতুর্থ। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুজাহিদরা একে একে প্রায় সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। সেনাপতি গ্রেব-এর সৈন্যরা প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। সাধারণতঃ এত বিপুল সৈন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া যায় না। কিন্তু গ্রেব-এর সামনে এক বিরাট উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে গ্রেব তার সমুদয় সৈন্যকে লাশে পরিণত করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

রুশ বাহিনী আরো দু'দিন উখলগুর উপর সামরিক চাপ বহাল রাখে। ৪ আগস্টের সন্ধ্যাবেলা তারা পুনরায় জোরদার এক অভিযান চালায়। এ অভিযানে তারা তাদের সহকর্মীদের লাশ দিয়ে মোর্চার কাজ নেয়। সামনের সৈন্য আহত বা নিহত হলে পিছন সারির সৈন্যরা তার লাশের আড়ালে বসে ফায়ার শুরু করে দেয়। এ

লড়াইয়েও অনেক মুজাহিদ শহীদ হন। তবে রুশদের ক্ষতির পরিমাণ ছিল কয়েকগুণ বেশি।
রাতে যথারীতি যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। ইমাম শামিল মসজিদে গিয়ে নায়েবদের উদ্দেশে ভাষণ দেন।
তিনি বলেনঃ
'আমরা স্রেফ আল্লাহর জন্য লড়াই করছি। আল্লাহ্র ইচ্ছা-ই আমাদের ইচ্ছা। পরিস্থিতি বড় কঠিন। মনে হচ্ছে, জার তার সব সামরিক শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। ভয় তো করবে তারা, যারা জীবনকে মায়া করে। আমাদের কাছে তো শাহাদাত জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয়। তথাপি এই কঠিন মুহূর্তে আপনাদের কারো নতুন কোন প্রস্তাব থাকলে তা ব্যক্ত করুন।'
নায়েব ইউনুসঃ আমাদের জীবন আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গিত। আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে আমার ধারণা, একই স্থানে চূড়ান্ত লড়াই করা কৌশলগত দিক থেকে আমাদের ঠিক হয়নি।
সুরখাই খানঃ এসব চিন্তা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে করা উচিত ছিল। চূড়ান্ত লড়াই করার সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর এখন এসব চিন্তা বৃথা।
ইউনুসঃ নতুন নতুন সৈন্য এসে রুশ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। আমরা এখন সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। অস্ত্র এবং রসদ শেষ হওয়ার পথে। আমাদের শাহাদাত আর আত্মহত্যার পার্থক্য বুঝা উচিত।
ইত্যবসরে ইমাম শামিলের খাদেম এসে বলে, হযরত! এরাগল থেকে একজন লোক এসেছেন। আপনাকে তিনি একটি জরুরী পয়গাম জানাতে চান।
ইমাম শামিলঃ কে এসেছে, নিয়ে এস তাকে। কয়েক মুহূর্ত পর এক আগন্তুক নিকটে এসে ইমামকে সালাম করে। লোকটির পরনের কাপড় ভিজা। ইমাম শামিল লোকটিকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করেন, রুশ প্রহরীরা তোমাকে আসতে দিল কিভাবে?
আগন্তুকঃ আমি নদীপথে সাঁতার কেটে এসেছি। মুরশিদের দোয়ায়ই বোধ হয় রুশরা আমাকে দেখতে পায়নি। আমার নাম তালহীক।
ইমাম শামিলঃ বল কি উদ্দেশ্যে এসেছ?
তালহীক মাথার পাগড়ী খুলে হাতে নেয়। পাগড়ীর ঝুলের গিড়া খুলে তাসবীহ ও আংটি বের করে। মুখ লাগিয়ে চুম্বন করে বস্তু দু'টো ইমামের প্রতি এগিয়ে ধরে বলে, পীর ও মুরশিদ তাঁর এই চিহ্নগুলো আমাকে দিয়েছেন, যাতে আমি যে তার শিষ্য, আপনার বিশ্বাস হয়।
ইমাম শামিল বস্তু দু'টোকে গভীরভাবে নীরিক্ষা করে দেখেন। অতঃপর আগন্তুককে বলেন, বলুন, কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন?
তালহীকঃ মহামান্য ইমাম! পীর ও মুরশিদ বলেছেন, এই বিপদসংকুল মুহূর্তে আমাদের ভালো-মন্দের ভার আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়া উচিত এবং আমাদের সব কিছু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বিসর্জন দেয়া দরকার। শায়খ বলেছেন, শিকারীর হাতে অবরুদ্ধ হওয়ার পর কৌশলে বেরিয়ে আসলে সিংহ বিড়াল হয়ে যায় না- সিংহ-ই থাকে এবং বনের রাজত্ব ফিরে পায়। অপরদিকে শক্ত পায়ে শিকারীর রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে তার পরিণতি স্পষ্ট। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, বিপদের সময় সিংহ তার বাচ্চাদের সাময়িকের জন্য চোখের আড়ালে নিয়ে রাখে, যাতে নিজে সহজে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে গারে। পীর ও মুরশিদ আরো বলেছেন, কয়েক বছর আগে ভারত উপমহাদেশে এক সিংহ ঠিক এমনিভাবে শিকারীর ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন, যেমনি আজ দাগিস্তানের ইমাম দুশমনের হাতে অবরুদ্ধ। সেই সিংহের নাম টিপু। সেই অবরোধ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তিনি নিজের দু' সন্তানকে জালিম শিকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে মুক্ত হয়ে তিনি জালিমদের সেই জুলুমের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন কড়ায়-গন্ডায়।
ইমাম শামিলঃ হ্যাঁ, মক্কা শরীফে কার কাছে যেন আমিও শুনেছিলাম যে, সুলতান টিপু সত্যিই সিংহের মত লড়াই করেছিলেন।
তালহীকঃ পীর ও মুরশিদের আদেশ, আপনাকে পয়গাম পৌঁছিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে খবর জানাতে হবে।

অন্যথায় এখনই আমি আপনার মুরীদ হয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। তবে মুরশিদকে খবরটা পৌছিয়ে আমি শিগগির ফিরে আসছি। অনুমতি হলে এবার উঠি।

সুরখাই খানঃ মহামান্য ইমাম! ইনি যাবেন কি করে? চারদিকে পাহারা। আসার সময় নদীর স্রোত তার অনুকূল ছিল। কিন্তু উজান ঠেলে যাওয়া যে কঠিন হবে!

তালহীকঃ আমি শায়খে এরাগলের শিষ্য। তারই নিকট থেকে রহস্যময় উপায় কাজ করার তরিকা আমার রপ্ত করা আছে। দীর্ঘ সময় পানিতে ডুব দিয়ে থাকার এবং ডুবন্ত অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার প্রশিক্ষণ আমার নেয়া আছে। তারপরও যদি দুশমন আমাকে দেখেই ফেলে, তাহলে আমার শাহাদাত নসীব হয়ে যাবে।

আগন্তুক বিদায় হয়ে যায়। ইমাম শামিল বিষয়টি গভীরতাবে ভেবে দেখার জন্য নির্জনে চলে যান।

৫ আগস্ট রুশ বাহিনী আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করে। মুজাহিদরাও বীরত্বের সাথে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই শুরু হয়।

রাতের বেলা।

সীমান্ত এক এলাকার সরদার আবদাল রুশ সেনাপতি গ্রেব-এর তাঁবুতে প্রবেশ করে। চলমান লড়াইয়ে আবদালের অবস্থান নিরপেক্ষ গ্রেবের সঙ্গে তার আলোচনা হয়। অতঃপর দু' হাজার স্বর্ণর্মুদ্রা নিয়ে হাসিমুখে বেরিয়ে যায় সে।

৬ আগস্ট ভোরবেলা আবদাল সাদা পতাকা হাতে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। রুশ সৈন্যরা তার গতিরোধ করে এবং ধরে কমান্ডারের কাছে নিয়ে যায়। খানিক পর সে পতাকা উঁচু করে ইমাম শামিলের মোর্চা অভিমুখে রওনা হয়। এ খবর ইমাম শামিলের কানে দেয়া হয়। ইমাম বলেন, ওকে ভিতরে আসতে দিও না। কি বলতে এসেছে, বাইরের চত্বরে দাঁড়িয়ে-ই বলতে বল। হতে পারে ও আমাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে এসেছে।

আবদালের সঙ্গে কথা বলার জন্য ইমাম শামিল সুরখাই খানকে প্রেরণ করেন। আবদাল সুরখাই খানকে বলে, রক্তক্ষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিগত কয়েক শতাব্দীতে কাফকাজে এত রক্ত ঝরেনি, যা এই এক মাসে ঝরেছে। আমি উভয় পক্ষের নিকট আপোসের প্রস্তাব নিয়ে ময়দানে এসেছি। আমি চাই, কোন পক্ষের আর এক ফোটা রক্তও না ঝরুক। ইমাম শামিলকে বলুন, তিনি যেন আলোচনার মাধ্যমে রুশদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করে নেন। খুনাখুনি অনেক হয়েছে; আর নয়।

সুরখাই খানঃ আলোচনার ব্যাপারে রুশদের কোন শর্ত আছে কি?

আবদালঃ আছে অবশ্যই। বিজয় এখন তাদের হাতের মুঠোয়। আজ না হোক কাল অবশ্যই ইমামের অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। অস্ত্র ত্যাগ করে আত্মসমর্পণ না করলে ধ্বংস সুনিশ্চিত। আলোচনা শুরু করার আগে রুশরা জামানত চায়, যাতে তারা উর্ধ্বতন অফিসারদের আশ্বস্ত করতে পারে।

সুরখাই খান ইমাম শামিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে যান। আবদাল সেখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে থাকে। খানিক পরে এসে সুরখাই খান আবদালকে বলেন, আপনি এখন যান, আবার এক সময় এসে জবাব নিয়ে যাবেন।

আবদাল চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান তোপগুলো গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ।

৬ আগস্ট রাতে তমীরখানশুরা থেকে পাঁচ হাজার রুশসেনা উখলগুর নিকটে এসে পৌঁছে। সেনাপতি গ্রেব-এর আদেশে তাদেরকে রণাঙ্গন থেকে কিছুটা দূরে থামিয়ে দেয়া হয়। উখলগুতে অবস্থানরত সেনাদের থেকেও দু' তিন হাজার সৈন্যকে রাতের আঁধারে তমীরখানশুরা থেকে আগত বাহিনীর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেনাপতি গ্রেব-এর আদেশ, আগামীকাল সূর্যোদয়ের পর থেকে যেন তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পতাকা উড়িয়ে উখলগু অভিমুখে অগ্রসর হতে শুরু করে।

৭ আগস্ট ভোর হওয়া মাত্র আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ইমাম শামিল মসজিদে দাঁড়িয়ে দূরবীনের সাহায্যে চারদিকের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। জর্জিয়ার সৈন্যরা এ দূরবীনটি ইমামকে উপহার দিয়েছিল।

হাজার হাজার রুশ সৈন্য উখলগু অভিমুখে এগিয়ে চলছে। নায়েব সুরখাই খান ও ইউনুস ইমামের কাছে

উপস্থিত। শিশু জামালুদ্দীনও কাছে দাঁড়িয়ে। এ সময়ে ইমাম বলেনঃ
“অনেক সৈন্য ধেয়ে আসছে। অস্ত্র থাকলে আমি আজ উখলগুকে রুশদের সমাধিতে পরিণত করে ছাড়তাম। কিন্তু অস্ত্র তো নেই। আমরা এখন কি করতে পারি!”
ঠিক এ সময়ে একটি গোলা এসে ইমামের অদূরে বিস্ফোরিত হয়। ইমাম অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যান। সুরখাই খান ও ইউনুস ইমামকে মোর্চায় নিয়ে যান।
সেদিন সন্ধ্যায় আবদাল আবার আসে। তার প্রস্তাবের জবাব চায় সে। সুরখাই খান ইমামের প্রতিনিধি হয়ে জবাব দেনঃ “নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির পরই কোন আলোচনা শুরু হতে পারে।”
এ জবাব শুনে আবদাল ফিরে যায়। পুনরায় তুমুল লড়াই শুরু হয়। সেনাপতি গ্রেব রাগে-ক্ষোভে পাগলের মত হয়ে যায় এবং অধীন অফিসারদের নিয়ে তর্জন-গর্জন করতে শুরু করে। বলে, এত হাজার হাজার সৈন্য হারাবার পরও যদি আমাদের লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে আমাদের বড় অপ্রীতিকর পরিণতি ভোগ করতে হবে। কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। ইমাম শামিলকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করার কোন একটা পন্থা আমাদের বের করতেই হবে।
এক মেজর পাঁচ ফুট চওড়া একটি কাঠের তক্তা নিয়ে সেনাপতির সামনে উপস্থিত হয়। তক্তার বহির্ভাগে লোহার পাত বসানো। মেজর তক্তাটি সেনাপতি গ্রেব-এর সামনে রেখে বলেন, দু'জন সৈন্য যদি এ তক্তাটি নিয়ে সামনে অগ্রসর হয় আর অন্যরা তার আড়ালে থেকে চলে, তাহলে মুজাহিদদের খঞ্জর ও গোলার আক্রমণ থেকে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। আপনার অনুমতি পেলে আমি বিষয়টি পরীক্ষাও করে দেখতে পারি। আমি এরকম একশত তক্তা তৈরি করেছি।
সেনাপতি গ্রেবঃ কোন অসুবিধা নেই। তবে আমাদের সৈন্যরা এমন পথে অগ্রসর হবে, যে পথে উপর থেকে বড় পাথর বা অন্য কোন ভারি বস্তু নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা নেই।
মেজর এক হাজার সৈন্যকে পঞ্চাশজন করে বিশটি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলকে এক একটি তক্তার আড়ালে হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আদেশ করে। প্রত্যেক দলে দু'জন করে সৈন্য হাটুতে ভর করে তক্তাকে সামনে ধরে ধীরে ধীরে এগুতে শুরু করে। অন্য সিপাহীরা পিছনে।
রুশ মেজরের এই রণকৌশল আংশিক সফল হয়। কোন কোন স্থানে উপর থেকে নিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথর তক্তা ভেঙ্গে চুরমার করে রুশ সেনাদের পিষে নীচে পতিত হলেও কয়েকটি দল এই আক্রমণ প্রতিহত করে সম্মুখসমরে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সাফল্য দেখে সেনাপতি গ্রেব আরো এক হাজার সৈন্যকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়। তক্তার আড়ালে নিরাপদে যারা মুজাহিদদের মোর্চার নিকটে পৌঁছুতে সক্ষম হয়, তাদের সঙ্গে মুজাহিদদের হাতাহাতি লড়াই হয়। হাতাহাতি লড়াইয়ে মুজাহিদরা বেশ বীরত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু রুশদের বিবেচনায় তাদের দশজন সৈনিকের মৃত্যু একজন মুজাহিদের শাহাদাতের সমান। নিজেদের দশজন সৈন্য খুইয়ে একজন মুজাহিদকে শহীদ করতে পারাকে তারা সাফল্য জ্ঞান করে। পরবর্তী কয়েকদিন পর্যন্ত রুশরা এ নিয়মে লড়াই অব্যাহত রাখে।
পরদিন প্রত্যুষ যখন পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হয়, তখন মুজাহিদদের পানির পাত্র শূণ্য হয়েছে দু'দিন পূর্ণ হলো। রসদ-পাতির মজুদও সম্পূর্ণ শেষ। বাচ্চাদের অবস্থা বড় করুণ। ক্ষুৎ-পিপাসায় চিৎকার করছে তারা। দু'দিনের অনাহারে মুজাহিদরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। রুশ সেনাপতি অবরুদ্ধ মুজাহিদদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়ার খবর পায়। রুশ প্রহরীদের অধিকতর সতর্ক হওয়ার জন্য তাকিদ করা হয়।
আবদালকে পুনরায় ইমাম শামিলের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেনাপতি গ্রেব-এর অধীন এক অফিসার বলে, এখন এর প্রয়োজন কী? আর সামান্য চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই তো চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি। গ্রেব তাকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, এত আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত হবে না। শামিল অতি ধূর্ত মানুষ। কোন্ ফাঁকে পালিয়ে যাবে তুমি টেরও পাবে না। তাই আমাদের কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। তার পুত্রকে যদি আমরা কাবু করতে পারি, তাহলে বেটা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। আমিও এটাই চাই যে,

সে পালাবার চেষ্টা না করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাক।
নিরপেক্ষ সরদার আবদাল পুনরায় সুরখাই খানের সঙ্গে আলাপ করে। সুরখাই খান ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর। কিন্তু বলিষ্ঠ ও উচ্চকণ্ঠে কথা বলে তিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখতে সক্ষম হন। আবদাল বলে, রুশরা এ মর্মে সম্মত হয়েছে যে, ইমাম তার পুত্রকে আমার হাতে জামানত রাখলে আপনাদের সঙ্গে তারা আলোচনায় বসতে প্রস্তুত। আমি নিরপেক্ষ মানুষ , আলোচনার মাধ্যমে একটি মীমাংসা হয়ে গেলে জামালুদ্দীনকে আমি তার পিতার হাতে ফিরিয়ে দেব। চলমান রক্তক্ষয়ে আমার হৃদয় কাঁদছে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে আমি এর চেয়ে উত্তম আর পথ দেখছি না।
সুরখাই খান বলেন, আগামীকাল সকালে আপনাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। আবদাল চলে যায়।
১৭ আগস্ট রাতে শিশু-সন্তানদের জীবন হাতে নিয়ে মুজাহিদরা পানি সংগ্রহের জন্য নীচে অবতরণ করে। রুশদের গোলাবৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এ অভিযানে সাতজন মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করেন।
কয়েকজন দুর্ধর্ষ মুজাহিদ খাদ্য সংগ্রহের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। রুশ বাহিনীর ক্যাম্প থেকে খাদ্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় তারা। তাদেরও কয়েকজনের শাহাদাত নসীব হয়।

জামানত

১৭ আগস্ট পূর্বাকাশে যখন সূর্য উদয় হয়, তখন যুদ্ধের বয়স ৫১ দিন। ইমাম শামিল পুত্র জামালুদ্দীনকে জামানতস্বরূপ নিরপেক্ষ সরদার আবদাল এর হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জামালুদ্দীনের মা পুত্রকে উত্তম পোষাক পরিয়ে সাজিয়ে দেন। পিতা অস্ত্রসজ্জিত করেন পুত্রকে। কোমরে তরবারী ও খঞ্জর বেঁধে দেন জামালুদ্দীনের। নায়েব সুরখাই খান, ইউনুস ও আমীর কালো পতাকা উড়িয়ে ইমাম পুত্রের সম্মুখে সম্মুখে এগিয়ে চলেন।
খানিক দূরে আবদাল দু'টি ঘোড়া নিয়ে দণ্ডায়মান। একটি কালো, অপরটি সাদা। জামালুদ্দীন সাদা ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পলকের জন্য পিছন দিকে তাকায়। বিধ্বস্ত মসজিদের ধ্বংসাবশেষের উপর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন ইমাম। পলকহীন চোখ দু'টো কলিজার টুকরা জামালুদ্দীনের প্রতি নিবদ্ধ তার।
জামালুদ্দীন লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসে। পতাকা অবনমিত করে জামালুদ্দীনকে সালাম জানায় নায়েব।
আবদাল অপর ঘোড়ায় চেপে বসে। দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি এগুতে শুরু করে। ঘন বৃক্ষরাজির আড়ালে মিলিয়ে যায় ঘোড়া দু'টো।
১৯ আগস্ট প্রত্যুষে রুশ সেনাপতি পিলুপাঞ্চ বেশ ক'জন অফিসার নিয়ে উখলগু এসে পৌঁছে। ইমাম শামিলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সেনাপতি গ্রেব-এর পক্ষ থেকে এসেছে সে। ইমাম শামিল বিশিষ্ট নায়েবদের নিয়ে গুহার মত একটি পাতাল গৃহে রুশ প্রতিনিধিদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।
সেনাপতি পিলু গুহায় প্রবেশ করে ইমামের প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ইমাম নির্বিকার। রুশ সেনাপতির সঙ্গে হাত মিলালেন না তিনি। চেহারায় তার আত্মমর্যাদার ছাপ।
'আমরা অহংকারীদের সাথে হাত মিলাই না।' বললেন সুরখাই খান। লজ্জায়-ক্ষোভে লাল হয়ে যায় সেনাপতি। সুরখাই খানের প্রতি আড়চোখে দৃষ্টিপাত করে সে। অবশেষে নিজেকে সংবরণ করে ইটের উপর বিছানো একটি কাঠের তক্তায় বসে পড়ে।
আলোচনা শুরু হল।
'যুদ্ধে আপনি পরাজিত। এবার নিয়মতান্ত্রিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করুন। শাহেনশাহ আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন।' সেনাপতি বলল।
এক রণাঙ্গনের ফলাফল গোটা যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নয়। নিয়মতান্ত্রিকভাবে অস্ত্রসমর্পণ করতে শিখিনি আমরা। তবে আমাদের দু'টি শর্ত মেনে নিলে ভবিষ্যতে আমরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে পারি।' বললেন ইমাম

শামিল।
সেনাপতি পিলুঃ বলুন, শর্ত দু'টো কী আপনার?
ইমাম শামিলঃ প্রথম শর্ত, যুদ্ধ বন্ধ করে আমরা গমরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাই। পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে আমাদের। দ্বিতীয় শর্ত, আমার পুত্র জামালুদ্দীন আবদালের কাছেই থাকবে। আমাদেরকে মাসে অন্ততঃ একবার তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এই চুক্তি বহাল থাকবে, ততদিন আমরা কোন পদক্ষেপ নেব না।
'জামালুদ্দীন তো এখন তমিরখানশুরা অতিক্রম করে তিবলীস অভিমুখে এগিয়ে চলছে। শাহেনশাহ নিজেই তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।' নিষ্ঠুর অট্টহাসি হেসে বলল সেনাপতি।
ঝেঁকে উঠে ইমামের সমস্ত দেহ। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়ে উঠে তাঁর। প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগে তাঁর হৃদয়ে। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে- শোকে লাল হয়ে যায় তার চেহারা। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন রুশ সেনাপতির মুখের দিকে। অতঃপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'আবারো তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। আমি এর প্রতিশোধ নেব। বড় ভয়ংকর হবে সেই প্রতিশোধ।'
সেনাপতি পিলুর মুখে কটাক্ষ হাসি। বলে, নিজের জীবনের প্রতি রহম করুন জনাব! অস্ত্রত্যাগ না করলে নিজের সাধের জীবনটাও খোয়াতে হবে আপনার।
'যে লজ্জাকর প্রতারণার প্রদর্শন তোমরা করেছ, এখান থেকে জীবিত ফেরত যেতে না দেয়াই ছিল তার উপযুক্ত জবাব। কিন্তু আমরা মুসলমান। তোমাদের মত ইতরামী করতে পারি না আমরা। তোমরা বলছ, তোমাদের সাম্রাজ্য অনেক বিশাল, তোমাদের জার বিরাট এক রাজা। এটাই কি সেই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মহান রাজার মহান সেনাপতিদের চরিত্র? চলে যাও এখান থেকে।' ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন ইমাম।
রুশ অফিসাররা ফিরে যায়। তাদের ক্যাম্পে পৌঁছানোর সাথে সাথে রুশী তোপ-কামাল গোলাবর্ষণ শুরু করে। বাংকারে পৌঁছে ইমাম তাঁর নায়েবদের নিয়ে পরামর্শে বসেন। রাশিয়ানদের এই বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই অবরোধ থেকে বের হতে হবে। সিদ্ধান্ত হয়, ইমাম শামিল কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ, মা-বোন-স্ত্রী ও শিশুপুত্র সাঈদকে নিয়ে অবরোধ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। অবশিষ্ট মুরীদগণ রুশদের মোকাবেলা করবেন। অপরদিকে রুশরাও ইমামের পালাবার সকল পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।
২০ আগস্টের ঘুটঘুটে আঁধার রাত। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ইমাম শামিল ফাতেমা, গাজী মুহাম্মদ, সাহেদা, মা, বোন, দুধের শিশু সাঈদ এবং দশজন জানবাজ মুরীদকে সঙ্গে নিয়ে রশির সাহায্যে উখলগুর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে নেমে পড়েন। ফাতেমা তখন অন্তঃসত্ত্বা। তৃতীয় সন্তানের মা হতে তার মাত্র এক মাস বাকী। রশি বেয়ে নীচে অবতরণ করতে সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাকে। চারদিকে রুশদের তাক করা রাইফেল আর তোপ। দক্ষিণ দিকে আধা ফার্লং দূরে নদীর ভিতরে এক চড়া। একটি গুহা তৈরি হয়ে আছে তাতে। ইমাম শামিলের পরিকল্পনা, প্রথমে সেই চড়ায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। তারপর সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা।
একজন একজন করে প্রত্যেকে উখলগুর উপর থেকে নীচে নেমে আসেন। শেষে রশির-ই সাহায্যে উপর থেকে নামিয়ে আনা হয় কয়েকটি কাঠের তক্তা। নায়েব রশি দিয়ে বাঁধেন তক্তাগুলো। অতঃপর ঘাস আর কাপড় দ্বারা তৈরি পাঁচজন মানুষ নামিয়ে আনা হয় নীচে। মুজাহিদের পোষাকে ঘাস ভরে তৈরি করা হয়েছিল মানুষগুলো। এই কৃত্রিম মানুষগুলোকে দাঁড় করিয়ে কষে বাঁধা হয় তক্তার সাথে।
ইত্যবসরে আকাশে বিজলী চমকায়। বিজলীর আলোতে রুশ সৈন্যরা দেখতে পায় কয়েকজন মুজাহিদ নৌকায় বসে আছে। গুলি ছুড়তে শুরু করে তারা। ইমাম ও নায়েব নেমে পড়েন পানিতে। একটি গুলি এসে ইমামের বোনের গায়ে বিদ্ধ হয়। সংবরণের চেষ্টা করে সে। কিন্তু তার অজান্তে মুখ থেকে তার বেরিয়ে আসে চাপা আর্তচীৎকার। ইমাম সঙ্গে সঙ্গে মোড় ঘুরিয়ে টেনে পানিতে নিয়ে আসেন বোনকে। হাত চেপে ধরে তার মুখে, যাতে আর চীৎকার করতে না পারে এবং দুশমন তাদের উপস্থিতি টের না পায়। কিন্তু মুহূর্ত পর মৃত্যুর কোলে

ঢলে পড়ে সে। শহীদ হন ইমামের বোন।
কাঠের তক্তাগুলো পানিতে ভাসিয়ে দিতে আদেশ করেন ইমাম। কিছুক্ষণ পর আবার বিজলী চমকায়। ততক্ষণে তক্তাগুলো ভেসে চলে গেছে অনেক দূর। তক্তার উপর দাঁড় করিয়ে বাঁধা কৃত্রিম মানুষগুলোকে মুজাহিদ মনে করে রুশ সৈন্যরা রাইফেলের মুখ ঘুরিয়ে দেয় সেদিকে। এ সুযোগে সঙ্গীদের নিয়ে সামনের চড়ার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন ইমাম।
তীব্র স্রোতে বয়ে চলেছে নদী। স্রোতের বিপরীতে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। এক নায়েব গাজী মুহাম্মদকে বুকে জড়িয়ে রাখেন। অপরজন সাইদকে। যাহেদা বেগম সাঁতার কাটছে। এক নায়েব ভর দিয়ে রেখেছেন ফাতেমাকে। তাকে সামলে রেখেছেন ইমাম নিজে।
কতগুলো মানুষের ঈমানদীপ্ত দৃঢ়তা আর আবর্তসংকুল নদীর তীব্র উর্মিমালার মাঝেও চলছে যুদ্ধ। ঈমান ও কুফরের অসম লড়াই।
আবার বিজলী চমকায়। পানির মধ্যে ডুব মেরে আত্মগোপন করে তারা। এবার বিজলী নেই। চতুর্দিক সূচীভেদ্য অন্ধকার। নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। হঠাৎ তীব্র এক ঢেউ কি একটি ভারী বস্তু ছুড়ে মারে ইমাম শামিলের প্রতি। ইমামের মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত হানে। ব্যাথায় কুঁকিয়ে উঠেন ইমাম। পর মুহূর্তে স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে পাঁক খেয়ে আবার সেটি ছিটকে এসে তীব্রগতিতে হাতুড়ীর মত নিক্ষিপ্ত হয় ইমামের মায়ের কপালে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মা। বস্তুটি ছিল শক্ত একটি কাঠ।
মাকে কাঁধে তুলে নেন ইমাম। বহু কষ্টে মাকে নিয়ে সম্মুখের চড়ায় গিয়ে পৌঁছেন তিনি। কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখেন মাকে। ততক্ষণে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ফেলেছেন ইমামের মা।
ফাতেমার অবস্থাও শোচনীয়। ইমাম অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন, 'আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টি-ই আমার সন্তুষ্টি। আমায় তুমি ধৈর্য ধারণের তাওফীক দাও'
শোকাহত ইমাম মায়ের মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেন। ২২ আগস্ট সারাদিন তারা গুহায় লুকিয়ে থাকেন। রাতে নায়েবগণ পরবর্তী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এখন তারা যে চড়ার গুহায় লুকিয়ে আছেন, তার থেকে এক শত ফুট দূরে আরো কয়েকটি চড়া। সেগুলোর পরে নদীর স্রোত তত তীব্র নয় কিন্তু এই একশত ফুট জায়গায় স্রোতের তীব্রতা এতই বেশী যে, এ পথটুকু অতিক্রম করা অসম্ভব।
ভেবে-চিন্তে নায়েবগণ সিদ্ধান্ত নেন, যে কোনভাবে হোক, এক দু'জন লোক একটি রশি নিয়ে স্রোত টেনে পরবর্তী চড়ায় পৌঁছুতে হবে এবং রশির এক মাথা সেখানে বড় একটি পাথরের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর রশি বেয়ে দুই প্রান্তরের মাঝের পথটুকু অতিক্রম করতে হবে সকলকে।
কিন্তু রশি বাঁধার জন্য অপর চড়ায় যাওয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার-ই শামিল। তবে নায়েবগণ সকলেই এ ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইমাম শামিম বললেন, 'এ কাজ আমি করব'।
ইমাম শামিল রশির এক মাথা কোমরে বেঁধে আল্লাহু নাম নিয়ে পানিতে নেমে পড়েন। তাঁর প্রত্যয় পানির স্রোতের উপর জয়ী হয়। অপর চড়ায় পৌঁছে রশিটি বড় একটি পাথরের সঙ্গে বেঁধে সেই রশি ধরেই ফিরে আসেন তিনি। এবার এক এক করে পালাক্রমে রশি বেয়ে সম্মুখের চড়ায় চলে আসতে শুরু করেন সবাই। এভাবে স্রোত অতিক্রম করা সন্তান-সম্ভাবনা ফাতেমার জন্য ছিল বেশ কষ্টকর। অবশেষে ইমামের পরামর্শে ফাতেমা রশির অপর মাথা কষে দেহের সঙ্গে বেঁধে নেন এবং পানিতে নেমে পড়েন। অপরদিক থেকে দ্রুতগতিতে রশি টেনে ফাতেমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে একে একে প্রত্যেকে সম্মুখের চড়ায় পৌঁছে যান।
এ চড়ায় আত্মগোপন করার মত জায়গা নেই। সামনের নদীর স্রোত-ও তেমন তীব্র নয়। তাই ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে কেটে সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করেন তারা। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করে তারা নদীর কুলে আসার চেষ্টা করেন। ঠিক এ সময়ে কি একটি জলজ প্রাণী ঠোকর মারে ফাতেমার ঘাড়ে। ভয়ে ফাতেমার মুখ থেকে চীৎকার বেরিয়ে আসে। মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে কুলে অবস্থানরত রুশ সৈন্যরা অন্ধকারে ফায়ার করতে শুরু করে। ফাতেমাকে সামলে নিয়ে ইমাম কুলের প্রায় নিকটে চলে আসেন। ফাতেমাকে নদীর কুলে

একটি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে ইমাম ধীরে ধীরে উপরে উঠে যান। অতক্ষণে রুশ সৈন্যদের এলোপাতাড়ি গুলিতে সাহেদা বেগম, শিশু সাঈদ এবং দু'জন নায়েব শহীদ হয়ে যান। গাজী মুহাম্মদের পায়েও একটি গুলি বিদ্ধ হয়।

উপরে উঠেই ইমাম খঞ্জর হাতে নেন। আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন রুশ বাহিনীর উপর। চোখের পলকে তাঁর খঞ্জরের আঘাতে ৯ রুশ সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দশম জন আত্মসংবরণ করে ইমামকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে। গুলিটি ইমামের ডান বাহুতে এসে বিদ্ধ হয়। কিন্তু আরেকটি গুলি ছোড়ার সুযোগ দেননি তাকে ইমাম। উল্টো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের খঞ্জর আমূল বসিয়ে দেন তার পেটে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় সে।

অন্য সিপাহীরা এদিকে মনোযোগী হওয়ার আগেই ইমাম শামিল ফাতেমা, আহত গাজী মুহাম্মদ এবং জীবনে রক্ষা পাওয়া চার নায়েবকে নিয়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে যান। রুশ সৈন্যরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে।

সঙ্গীদের নিয়ে অতি সন্তর্পণে ইমাম শামিল গমরী গিয়ে পৌঁছেন। ইমামের স্ত্রী ফাতেমার ক্লান্ত দেহ এখন অসাড়। মুখমণ্ডল তার ফ্যাকাশে, দু'চক্ষু কোঠরাগাত। ব্যাথায় চীৎকার করছে শিশু গাজী মুহাম্মদ। দু'দিনের না খাওয়া তারা সকলে। সঙ্গীদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার কথা বলে ইমাম নিজেও একটি পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে যান। মুহূর্ত মধ্যে রাজ্যের ঘুম নেমে আসে তার ক্লান্ত চোখে।

পরদিন ভোর বেলা। পূর্বাকাশে সূর্য উকি-ঝুঁকি মারছে। কারো পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায় ইমামের। হঠাৎ চমকিত হয়ে উঠে বসেন তিনি। খঞ্জর হাতে নেন।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক আগন্তুক। ইমাম তাকে দেখেননি কখনো। একেবারেই অপরিচিত লোকটি। হাতে তার একটি পুটুলী।

অকস্মাৎ ইমামের এক নায়েব আগন্তুকের পিছনে এসে দাঁড়ান। আগন্তুক ইমামকে উদ্দেশ করে বলে, আপনি বোধ হয় আমাকে জানেন না। আমি কিন্তু আপনাকে জানি। আমি মোল্লা মুহাম্মদের পুত্র মোল্লা আহমদ। আল্লাহ্ শোকর যে, তিনি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আর আমি আমার কৈফিয়ত পেশ করার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

'কৈফিয়ত?' ইমামের কণ্ঠে বিস্ময়।

জি হ্যাঁ, কৈফিয়ত! আগে আপনি কিছু খেয়ে নিন। বিস্তারিত কথা পরে হবে। বলেই মোল্লা আহমদ পুটুলিটি ইমামের সামনে রেখে দেন। নায়েব পুটুলিটি খুলে দেখেন, ভুনা গোশত আর রুটি। গোশত-রুটির একটি টুকরা মুখে দিয়ে দেখেন নায়েব। অতঃপর ইমামকে বলেন, 'অসুবিধা নেই খেতে পারেন'।

'আপনি বসুন, সব ঘটনা খুলে বলুন।' মোল্লা আহমদকে উদ্দেশ করে বললেন ইমাম।

ইমাম শামিল ও তাঁর নায়েব আহার করছেন আর মোল্লা আহমদ ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন, 'আমার জান্নাতবাসী পিতার পক্ষ থেকে আপনাকে যে পয়গাম দেয়া হয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট, মিথ্যা।'

থমকে যান ইমাম। হাতের রুটি তাঁর ছুটে পড়ে যায় নীচে। মুখে দেয়া রুটি চিবুতে ভুলে যান। অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন মোল্লা আহমদের মুখের দিকে। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে কাঁপা কণ্ঠে বলেন, 'জান্নাতবাসী?'

'জি হ্যাঁ, আব্বাজান শাহাদতবরণ করেছেন। একবার কয়েকজন গাদ্দার অজ্ঞান করে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় রুশ ফৌজের ক্যাম্পে। কঠোর নির্যাতনের মুখে শহীদ করা হয় তাঁকে। তাঁর আংটি ও তসবীহসহ এক গাদ্দারকে পাঠানো হয় আপনার কাছে। আমি ঘটনা জানতে পারি দু'দিন পর। এক রুশ গুপ্তচর ঘটনাটি আমাকে জানায়। লোকটি ছিল আব্বাজানের শিষ্য। তাই আব্বাজানের এই করুণ মৃত্যুতে সেও মর্মাহত হয় এবং সব ঘটনা আমাকে খুলে বলে।' বললেন, মোল্লা আহমদ।

'তা এখানে আপনি আসলেন কী করে?' জিজ্ঞাসা করেন ইমাম।

'আপনাকে রুশদের প্রতারণার সংবাদ জানানোর জন্য বেশ ক'দিন ধরেই আমি এখানে আসবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তাদের প্রহরা ব্যবস্থা এত কঠোর যে, ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। আমার বিশ্বাস ছিল,

আল্লাহ্ আপনাকে শত্রুর অবরোধ থেকে জীবিত বের করে আনবেন। আমার মন বলছিল যে, আমি অবশ্যই আপনার সাক্ষাৎ পাব। আল্লাহর শোকর, আপনাকে আমি পেয়ে গেছি। এখন দ্রুত আপনি এখান থেকে চলে যান। গমরীর প্রতিটি প্রান্ত চষে ফিরবে রুশ বাহিনী।' বললেন মোল্লা আহমদ।

'আহ্! পীর ও মুরশিদ! আল্লাহ্ তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন। জীবিত থাকতে তিনি আমাকে দিক- নির্দেশনা দিতেন। এখন আমি আপনার পরামর্শ কামনা করি।' বললেন ইমাম।

'অবস্থার পরিবর্তনে আপনজনরাও পর হয়ে যায়। মানুষ এখন দুনিয়া অন্বেষণে ব্যস্ত। চিন্তাধারা বদলে গেছে মানুষের। অচিরেই আপনার মাথার মূল্য ধার্য হয়ে যাবে এবং যে কেউ সেই মূল্য হাতে আনতে চেষ্টা করবে। আমার পরামর্শ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি দাগিস্তান ত্যাগ করুন এবং ফিরে আসার জন্য উপযুক্ত পরিস্থিতির অপেক্ষা করুন।' বললেন, মোল্লা আহমদ।

২৯ আগস্ট প্রত্যুষে সেনাপতি গ্রেব তার অধীন অফিসারদের বলে, 'কমান্ডার ইন চীপ যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য এবং শামিলকে জীবিত বা মৃত দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব। কাজেই আজ চূড়ান্ত আক্রমণ চালাও।

শুরু হয় রুশ বাহিনীর চূড়ান্ত আক্রমণ। কিন্তু কোন প্রতিরোধ নেই কোথাও। ২৮ আগস্ট পাহাড়ে- পাহাড়ে রহস্যময় এক ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল যে, 'কেউ নিজের জীবন নিয়ে পালাতে চাইলে বেরিয়ে যেতে পার।' ঘোষণা শুনে এখনো বেঁচে থাকা মুজাহিদগণ মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে নদীর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কতিপয় নদী সাঁতরে জীবন নিয়ে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়, আর কতিপয়ের সলিল সমাধি ঘটে।

কোথাও কেউ প্রতিরোধ করছে না, শামিলের কোন পাত্তা নেই, এই সংবাদ শুনে সেনাপতি গ্রেব ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পাগলের মত আবোল-তাবোল বকতে শুরু করে সে। অবরুদ্ধ মুজাহিদদের সর্বশেষ বাংকার পর্যন্ত পৌঁছে যায় গ্রেব। ঝাঝালো কণ্ঠে আদেশ করে, 'ধ্বংসস্তূপ খুড়ে দেখ, গোপন বাংকার তালাশ কর। প্রতিটি লাশ গভীরভাবে পরীক্ষা কর। ওকে বা ওর লাশ খুঁজে বের কর।'

হাজার হাজার রুশ সৈন্য উখলগুর প্রতিটি প্রান্তে তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালায়। ধ্বংসস্তূপ খুড়ে দেখে। প্রতিটি গুহায় গিয়ে অনুসন্ধান করে। পাথর সরিয়ে সরিয়ে নীচে গোপন পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে অধীন অফিসার রিপোর্ট দেয়, কিছু-ই পাওয়া গেল না, স্যার!

শুনে সেনাপতি গ্রেব উত্তেজিত কণ্ঠে অফিসারকে বকতে শুরু করে, 'কিছু-ই পেলি না! লোকটি কি তাহলে আকাশে উড়ে গেল, না মাটিতে ধসে গেল! আমার সব ত্যাগ কি বিফলে গেল! হাজার হাজার রুশ সেনার জীবন কি কোনই কাজেই আসল না! যাও ওকে খুঁজে বের করে আন। আমি শামিলকে চাই-ই চাই। এর অন্যথা আমি শুনতে প্রস্তুত নই। মনে রেখ, যদি শামিল পালিয়ে গেছে প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রহরীদের প্রত্যেককে আমি গুলি করে উড়িয়ে দেব।'

রাতভর মশালের আলোতে জীবিত বা মৃত শামিলের অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে। পরের দিন ৩০ আগস্টও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ আর কবর খুড়ে খুড়ে লাশ শনাক্ত করা হয়।

৩১ আগস্ট সেনাপতি গ্রেব অফিসারদের বৈঠক আহ্বান করে। যথাসময়ে অধিবেশন শুরু হয়। গ্রেব বলে, ইমাম শামিল জীবিত বেরিয়ে গেছে না মারা পড়েছে, তা নিশ্চয়তার সাথে বলা যাচ্ছে না। সত্যি সত্যিই যদি সে জীবন নিয়ে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে পুনরায় সে অধিক শক্তি সঞ্চয় করে যে আত্মপ্রকাশ করবে, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর সে উত্থান ঠেকাবার শক্তি কারো থাকবে না। অন্ধ বিশ্বাসীরা তার এ জীবন নিয়ে বের হওয়াকে বড় কারামত মনে করবে। তা ছাড়া শামিল পালিয়ে গেছে একথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা প্রকাশ্যে তাকে সন্ধান করতে পারব না। তাই আমাদের নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে দাগিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে দাও। তাতে যত ব্যয় যাবে যাক। ওকে গোপনে সন্ধান কর। যদি সে মারা গিয়ে থাকে, তবে তার মৃত্যু স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ কর।

কয়েকজন সিপাহী ও অফিসার নিয়ে সেনাপতি গ্রেব তমিরখানশুরা পৌঁছে যায়। তিবলিসে কমান্ডার ইনচীপ এর নিকট বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করে। কমান্ডার ইন চীপ রাজধানী সেন্টপিটার্সবার্গে শাহেনশাহ নেকুলাইকে

সুসংবাদ শোনানোর আয়োজন শুরু করে দেয়। জার-এর আদেশে এক সপ্তাহ পর্যন্ত উৎসব পালন করা হয়। উখলগুতে বীরত্ব প্রদর্শনকারী অফিসার-সিপাহীদের জন্য বিশেষ সংবর্ধনা ও মাল্যের আয়োজন করা হয়। কমান্ডার ইন চীপ তমিরখানশুরা পৌঁছে তার অফিসার ও জওয়ানদের গলায় মাল্য পরিয়ে দেয়।

(চলবে)

অনুবাদঃ মুহাম্মদ মহিউদ্দীন

*****